ফিকহে হানাফীঃ কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য

মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আব্দুল্লাহ

জীবনের অঙ্গন অতি বিস্তৃত এবং অতি বৈচিত্রময়। ইসলাম যেহেতু পূর্ণাঙ্গ দ্বীন তাই তা জীবনের সকল বৈচিত্রকে ধারণ করে। জীবনের সকল বিভাগ তাতে নিখুঁতভাবে সন্নিবেশিত। ইসলামী জীবন-দর্শনের পরিভাষায় মানব-জীবনের মৌলিক বিভাগগুলো নিম্নোক্ত শিরোনামে শ্রেণীবদ্ধ হয়েছে : ১. আকাইদ (বিশ্বাস), ২. ইবাদাত (বন্দেগী ও উপাসনা), ৩. মুআমালাত (লেনদেন), ৪. মুআশারাত (পারিবারিক ও সামাজিক নীতি এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা) ও ৫. আখলাক (চরিত্র, আচরণ ও নৈতিকতা)। বলাবাহুল্য যে, প্রতিটি বিষয়ের অধীনে প্রচুরসংখ্যক মৌলিক শিরোনাম ছাড়াও রয়েছে প্রাসঙ্গিক বহু বিষয়। আমাদের সামনে হাদীস ও ফিকহের বহু বিষয়ভিত্তিক সংকলন বিদ্যমান রয়েছে। এসব গ্রন্থের সূচিপত্রে নজর বুলালে উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়ের ব্যাপকতা অনুমান করা যাবে। ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তার মৌলিক দুই সূত্র-কুরআন ও সুন্নাহ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত।

পূর্ণ কুরআন মজীদ এবং হাদীস ও সুন্নাহ্র উল্লেখযোগ্য অংশ ‘তাওয়াতুরে’র মাধ্যমে এসেছে। হাদীস ও সুন্নাহর অপর অংশটিও এসেছে ‘রেওয়ায়েত’ ও ‘আমলে’র নির্ভরযোগ্য সূত্রে। হাদীসের মৌলিক গ্রন্থসমূহে প্রতিটি হাদীস সনদসহ সংকলিত হয়েছে। এতে যেমন রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ও কর্ম তেমনি রয়েছে মুজতাহিদ সাহাবা ও তাবেয়ী ইমামগণের ফতোয়া ও আমলের বিবরণ। পরবর্তী যুগের মুজতাহিদ ইমামগণের ফতোয়া ও আমলও ফিকহের মৌলিক গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মুসলিম উম্মাহকে দুটি মহান জামাতের ঋণ স্বীকার করতে হবে। তাঁরা হলেন আইম্মায়ে হাদীস ও আইম্মায়ে ফিকহ। হাদীসের ইমামগণ যেমন হাদীস ও আছারকে সূত্রসহ সংরক্ষণ করেছেন তেমনি ফিকহের ইমামগণ সংরক্ষণ করেছেন হাদীসের মর্ম ও আমলের ধারাবাহিকতা।

বর্ণনা ও রেওয়ায়েতের শুদ্ধাশুদ্ধির বিষয়ে আমরা যেমন হাদীস-শাস্ত্রের মুজতাহিদ ইমামগণের মুখাপেক্ষী তেমনি হাদীস ও সুন্নাহর যথার্থ অনুসরণের ক্ষেত্রে ফিকহের ইমামগণের উপর নির্ভরশীল। আপনি যে বিষয়েরই হাদীস অধ্যয়ন করুন, তা ইমামগণের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সংকলিত হয়েছে এবং আজ আমরা তা পাঠ করে ধন্য হচ্ছি। অতএব হাদীসকে হাদীস হিসাবে জানার ক্ষেত্রে আমরা হাদীস-শাস্ত্রের মুজতাহিদ ইমামগণের মুকাল্লিদ। তদ্রূপ

কুরআন-সুন্নাহ থেকে হালাল-হারামের বিধান, ইবাদতের সঠিক নিয়ম-কানুন, হুকুক ও অধিকার ইত্যাদি সঠিকভাবে জানার ক্ষেত্রে ফিকহ-শাস্ত্রের মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসারী। এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করার জন্য একটি মৌলিক বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার। তা এই যে, কুরআন-সুন্নাহর উপরোক্ত সকল নির্দেশনা মৌলিক দুই ভাগে বিভক্ত : ১. যা অনুধাবনে ইজতিহাদী পর্যায়ের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অপরিহার্য। ২. যা অনুধাবনে ইজতিহাদী পর্যায়ের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অপরিহার্য নয়।

প্রথম শ্রেণীর নির্দেশনাগুলো মূলত 'আহকাম' বিষয়ক। 'আহকাম' অর্থ হালাল-হারাম, জায়েয-না জায়েয এবং কর্তব্য ও কর্মপদ্ধতি বিষয়ক বিধান। দ্বিতীয় শ্রেণীর নির্দেশনাগুলো মূলত বিশ্বাস ও চেতনা এবং চরিত্র ও নৈতিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত, যা মানুষকে আখিরাতের চেতনায় উজ্জীবিত করে এবং ঈমান ও ইয়াকীনে সমৃদ্ধ করে। পাশাপাশি তা উন্নত মানবিক বোধ জাগ্রত করে এবং উত্তম হৃদয়-বৃত্তির অধিকারী করে। সর্বোপরি তা দান করে জীবন-যাপনের আদর্শ নীতিমালা। এই বিষয়বস্তুগত পার্থক্য অনুধাবনের জন্য আমরা কুরআন মজীদের মক্কী ও মাদানী সূরাগুলি তুলনা করে পাঠ করতে পারি। মক্কী সূরা বলতে বোঝানো হয় যে সূরাগুলি হিজরতের আগে অবতীর্ণ হয়েছে, আর মাদানী সূরা অর্থ যা হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়েছে। এদের মধ্যে বিষয়বস্তুগত মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মক্কী সূরাগুলোতে বিশ্বাস, চেতনা ও নীতি-নৈতিকতাই প্রধান। পক্ষান্তরে মাদানী সূরাসমূহে হুকুক ও আহকামের প্রাধান্য। হাদীস শরীফের ক্ষেত্রেও এই পার্থক্য অনুধাবন করা কঠিন নয়। তবে হাদীস শরীফের মৌলিক গ্রন্থসমূহে অর্থাৎ 'মাসানীদ', 'জাওয়ামি', 'মা'আজিম', 'সুনান' ইত্যাদিতে উভয় ধরনের হাদীস সংকলিত হয়েছে। 'সুনান' গ্রন্থসমূহে আহাদীসে আহকাম বিশেষভাবে সংকলিত হলেও অন্যান্য প্রসঙ্গও তাতে সন্থান পেয়েছে। এই উৎ স-গ্রন্থসমূহ থেকে আলিমগণ বহু ধরনের হাদীস-গ্রন্থ সংকলন করেছেন। পাঠক যদি মুনযিরীর 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব' ও নববীর 'রিয়াযুস সালেহীন'কে হাফেয যায়লায়ীর 'নাসবুর রায়াহ' ও হাফেয ইবনে হাজার আসকালানীর 'আলতালখীসুল হাবীরে'র সঙ্গে তুলনা করেন তাহলে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর হাদীসের বিষয়বস্তুগত পার্থক্য তাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এরপরের পর্যায়টি বেশ কঠিন। তা হচ্ছে হুকুক ও আহকাম বিষয়ক আয়াত ও হাদীস সম্পর্কে মুজতাহিদ ইমামগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা। এটা করতে সক্ষম হলে স্পষ্ট হবে যে, কুরআন-সুন্নাহর এই অংশটি প্রকৃতপক্ষেই ইজতিহাদের ক্ষেত্র। এই দীর্ঘ আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইজতিহাদ ও তাকলীদের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা। আশা করি উপরের আলোচনায় পরিষ্কার হয়েছে যে, কুরআন-সুন্নাহর আহকাম শ্রেণীর নির্দেশনাগুলোই মৌলিকভাবে ইজতিহাদ ও তাকলীদের ক্ষেত্র। এগুলো ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের ফলপ্রসূ

অধ্যয়নের জন্য দ্বীনের সঠিক রুচি ও বিষয়বস্তু সঠিকভাবে অনুধাবনের যোগ্যতা থাকাই যথেষ্ট। এজন্য হক্কানী উলামা-মাশায়েখের সোহবতের দ্বারা সঠিক দ্বীনী রুচি অর্জনের পর সাধারণ পাঠকও কুরআন-সুন্নাহ্‌র এই অংশ সরাসরি অধ্যয়ন করতে পারেন এবং তা থেকে দ্বীনী চেতনা আহরণ করতে পারেন।

পক্ষান্তরে আহকাম বিষয়ক অধিকাংশ নির্দেশনা সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে বোঝার জন্য ইজতিহাদী পর্যায়ের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অপরিহার্য। তাই তা অনুসরণের শরীয়তসম্মত পন্থা হচ্ছে : ১. যিনি ইজতিহাদের যোগ্যতার অধিকারী তিনি ইজতিহাদের ভিত্তিতে আমল করবেন। ২. যার ইজতিহাদের যোগ্যতা নেই তিনি মুজতাহিদের তাকলীদ করবেন। এটিই হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণের কুরআন-সুন্নাহসম্মত পন্থা। পক্ষান্তরে তৃতীয় পদ্ধতি, অর্থাৎ ইজতিহাদের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ইজতিহাদের প্রচেষ্টা কিংবা ইজতিহাদের যোগ্যতাহীন লোকের অনুসরণ, দু'টোই শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রত্যাখ্যাত। এই ভূমিকাটুকুর পর এবার আমরা মূল আলোচনায় প্রবেশ করছি।

শিরোনামে 'ফিকহ' শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। কুরআন-সুন্নাহ্‌য় উল্লেখিত হুকুম-আহকাম এবং পরবর্তীতে উদ্ভূত নানাবিধ সমস্যার কুরআন-সুন্নাহ্‌ভিত্তিক সমাধানের সুসংকলিত রূপকেই পরিভাষায় ফিকহ বলা হয়। যে ইমামগণ তা আহরণ করেছেন তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ করে এর বিভিন্ন নাম হয়েছে। যেমন ফিকহে হানাফী, ফিকহে মালেকী, ফিকহে শাফেয়ী ও ফিকহে হাম্বলী। এই সব ফিকহের, বিশেষত ফিকহে হানাফীর কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথম বৈশিষ্ট্য : কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক আমল করার স্বীকৃত পদ্ধতি

ফিকহে হানাফী ও অন্যান্য ফিকহের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণের স্বীকৃত ও সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি। চার মুজতাহিদ ইমামের ইজতিহাদী যোগ্যতা এবং তাঁদের সংকলিত ফিকহের নির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে গোটা মুসলিম উম্মাহ একমত। সর্বযুগের আলিমগণের স্বীকৃতি ও অনুসরণের দ্বারা এই সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনুল উযীর (মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম) ইয়ামানী (মৃত্যু : ৮৪০ হি.) বলেন, 'তাঁর (ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর) মুজতাহিদ হওয়ার বিষয়ে (মুসলিম উম্মাহর) ইজমা রয়েছে। কেননা, ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর মতামতসমূহ তাবেয়ী যুগ থেকে আজ নবম হিজরী পর্যন্ত গোটা মুসলিম জাহানে সর্বজনবিদিত। যারা তা বর্ণনা করেন এবং যারা অনুসরণ করেন কারো উপরই আপত্তি করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে মুসলিম উম্মাহর (আলিমগণের) অবস্থান হল, তাঁরা হয়তো সরাসরি তার অনুসরণ করেছেন, কিংবা অনুসরণকারীদের উপর আপত্তি করা থেকে

বিরত থেকেছেন। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এভাবেই ইজমা সম্পন্ন হয়ে থাকে।' তিনি আরো বলেন, 'বহু মনীষী আলিম পরিষ্কার বলেছেন যে, মুজতাহিদ যখন ফতোয়া দান করেন এবং সাধারণ মানুষ তার অনুসরণ করে তখন সমসাময়িক আলিমগণ আপত্তি না করলে প্রমাণ হয় যে, তিনি প্রকৃতপক্ষেই মুজতাহিদ। (পরবর্তী যুগের) আলিমদের জন্য যদি এ নীতি প্রযোজ্য হয় তাহলে তাবেয়ী যুগের কথা তো বলাই বাহুল্য। কেননা, তা ছিল জগদ্বিখ্যাত মনীষীদের যুগ। আর ইমাম আবু হানীফা রাহ. তাঁদেরই সমসাময়িক ছিলেন।'-আর রওযুল বাছিম, মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস পৃ. ১৬৪-১৬৫ এ বিষয়টি শুধু ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর ক্ষেত্রেই নয়, তাঁর মনীষী সঙ্গীদের ক্ষেত্রে এবং অন্য তিন ইমামের ক্ষেত্রেও সমান সত্য। আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার আশংকা না হলে এখানে মুসলিম জাহানের ওইসব মনীষীর একটি তালিকা উল্লেখ করা যেত, যাঁরা হাদীস-শাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা রা.-এর মতামত অনুসরণ করেছেন।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : কুরআন-সুন্নাহর আহকাম ও ফিকহুস সালাফের উত্তম সংকলন

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, ফিকহে হানাফী কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। উপরের আলোচনা থেকেও তা বোঝা যায়। ফিকহে হানাফীর সকল সিদ্ধান্ত কুরআন-সুন্নাহ ও আছারে সাহাবার ভিত্তিতে প্রমাণিত। ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর ফিকহ-সংকলনের নীতিমালা সম্পর্কে যাদের ধারণা রয়েছে তাদের এ বিষয়ে কোনো সংশয় থাকার কথা নয়। এ প্রসঙ্গে আমি উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের একটি মূল্যবান প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি : 'ফিকহে মুতাওয়ারাছ' (ফিকহের যে অংশ নবী-যুগ থেকে চলে আসছে) সংকলন এবং সাহাবা ও শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ীগণের যুগ শেষ হওয়ার পর উদ্ভূত নতুন সমস্যাবলির সমাধানের জন্য ইমাম আবু হানীফা রাহ.কে কী কী কাজ করতে হয়েছিল এবং এ বিষয়ে তাঁর কী কী অবদান রয়েছে-এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে গ্রন্থ রচনা করতে হবে। তাই আমি এখানে তাঁর নিজের ভাষায় শুধু এ বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই যে, ফিকহ ও ফতোয়ার বিষয়ে তাঁর মৌলিক নীতিমালা কী ছিল। 'এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সহীহ সনদে ইমাম আবু হানীফা রাহ. থেকে যে নীতিমালা উল্লেখিত হয়েছে তার সারকথা এই- ১. মাসআলার সমাধান যখন কিতাবুল্লাহ্য় পাই তখন সেখান থেকেই সমাধান গ্রহণ করি। ২. সেখানে না পেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ এবং সহীহ হাদীস থেকে গ্রহণ করি, যা নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সহীহ হাদীস আমাদের জন্য শিরোধার্য। একে পরিত্যাগ করে অন্য কিছুর শরণাপন্ন হওয়ার প্রশ্নই আসে না। ৩. এখানেও যদি না পাই তবে সাহাবায়ে কেরামের সিদ্ধান্তের শরণাপন্ন হই। ৪. কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ ও ইজমায়ে সাহাবার

সামনে কিয়াস চলতে পারে না। তবে যে বিষয়ে সাহাবীগণের একাধিক মত রয়েছে সেখানে ইজতিহাদের মাধ্যমে যার মত কিতাব-সুন্নাহ্র অধিক নিকটবর্তী বলে মনে হয় তা-ই গ্রহণ করি। ৫. মাসআলার সমাধান এখানেও পাওয়া না গেলে ইজতিহাদের মাধ্যমে সমাধানে পৌঁছে থাকি। তবে এক্ষেত্রেও তাবেয়ীগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হই না।- আলইনতিকা ফী ফাযাইলিল আইম্মাতিছ ছালাছাতিল ফুকাহা, ইবনে আবদিল বার পৃ. ২৬১, ২৬২, ২৬৭; ফাযাইলু আবী হানীফা, আবুল কাসিম ইবনু আবিল 'আওয়াম পৃ. ২১-২৩ মাখতূত; আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী, আবু আবদুল্লাহ আসসাইমারী (মৃত্যু : ৪৩৬ হি.) পৃ. ১০-১৩; তারীখে বাগদাদ, খতীবে বাগদাদী ১৩/৩৬৮; উকূদূল জুমান, মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ সালিহী পৃ. ১৭২-১৭৭; মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা, মুয়াফফাক আলমাক্কী ১/৭৪-১০০ 'ফিকহে মুতাওয়ারাছ সংকলন এবং 'ফিকহে জাদীদ' আহরণের যে নীতিমালা ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর নিজের ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে তা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর সকল ইমামের সর্বসম্মত নীতি। কোনো ফিকহ তখনই ইসলামী ফিকহ হতে পারে যখন তা উপরোক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে সংকলিত ও আহরিত হয়। 'ফিকহ-সংকলন এবং ফিকহ-আহরণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতিমালা অনুসরণে তিনি কতটুকু সফল হয়েছেন তা তাঁর সমসাময়িক তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি সকল ইসলামী শাস্ত্রের স্বীকৃত ইমামগণের বক্তব্য থেকে জানা যেতে পারে। ইমাম সুফিয়ান ছাওরী রাহ. (মৃত্যু : ১৬১ হি.) বলেন, 'আবু হানীফা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ইলম অন্বেষণ করেছেন। তিনি ছিলেন (দ্বীনের প্রহরী) দ্বীনের সীমানা রক্ষাকারী, যাতে আল্লাহর হারামকৃত কোনো বিষয়কে হালাল মনে করা না হয়, কিংবা হালালের মতো তাতে লিপ্ত থাকা না হয়। যে হাদীসগুলো তার কাছে সহীহ সাব্যস্ত হত, অর্থাৎ যা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণ বর্ণনা করে এসেছেন, তার উপর তিনি আমল করতেন এবং সর্ববিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ আমলকে গ্রহণ করতেন। কুফার আলিমগণকে যে আমল ও ধারার উপর প্রতিষ্ঠিত দেখেছেন তিনিও তা থেকে বিচ্যুত হননি (কেননা, এটাই ছিল সাহাবা যুগ থেকে চলমান আমল ও ধারা)।- আলইনতিক্বা, ইবনে আবদিল বার পৃ. ২৬২; ফাযাইলু আবী হানাফী, ইবনু আবিল 'আওয়াম পৃ.. ২২ (মাখতূত)। '... এজন্য হাদীস শাস্ত্রের সর্বজনস্বীকৃত মনীষী ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহ. (১৮১ হি.) বলেছেন, 'আবু হানীফার ফিকহকে নিছক রায় (মত) বলো না। প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে হাদীসের ব্যাখ্যা।'-ফাযাইলু আবী হানীফা,, ইবনু আবিল 'আওয়াম পৃ. ২৩'' (ফিকহে হানাফীর সনদ, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক, মাসিক আলকাউসার জুলাই '০৭ পৃ. ৯) যোগ্য ব্যক্তির জন্য সরাসরি পরীক্ষা করে দেখারও সুযোগ রয়েছে। হাফেয যায়লায়ী রাহ. (৭৬২ হি.) কৃত 'নসবুর রায়া ফী তাখরীজি আহদীছিল হিদায়া' গ্রনে'র ভূমিকায় আল্লামা যাহিদ কাওছারী রাহ. লেখেন, 'পাঠক যদি এই গ্রনে'র পৃষ্ঠা ওল্টাতে থাকেন এবং বিভিন্ন অধ্যায়ে সংকলিত হাদীসগুলো পাঠ করেন তাহলে তার প্রত্যয় হবে যে, হানাফী

মনীষীগণ শরীয়তের সকল বিষয়ে হাদীস ও আছারের নিষ্ঠাবান অনুসারী।' (ভূমিকা, নাসবুর রায়াহ পৃষ্ঠা : ১৯) ইমাম আবদুল ওয়াহহাব আশশা'রানী রাহ. (৮৯৮-৯৭৩ হি.) বলেন, 'আমি যখন (চার) মাযহাবের দলীল বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছি তখন, আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া যে, ইমাম আবু হানীফা রাহ. ও তাঁর সঙ্গীদের মতামত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ হয়েছে। আমি লক্ষ করেছি যে, তাঁদের সিদ্ধান-গুলোর সূত্র হচ্ছে কুরআন মজীদের আয়াত, (সহীহ) হাদীস ও আছার অথবা তার মাফহুম, কিংবা এমন কোনো হাদীস, যার একটি সনদ যয়ীফ হলেও মূল হাদীস একাধিক সনদে বর্ণিত, অথবা নির্ভরযোগ্য উসূলের উপর কৃত কিয়াসে সহীহ।'-আলমীযান পৃ. ৫২; আবু হানীফা ওয়া আসহাবুহুল মুহাদ্দিসূন পৃ. ৬১

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : শূরাভিত্তিক সংকলন

ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর একটি বিশেষত্ব এই যে, তিনি ছিলেন সঙ্গী-সৌভাগ্যে অতি সৌভাগ্যবান। সমকালীন শ্রেষ্ঠ মনীষার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁর সঙ্গে ছিল। কুরআন-সুন্নাহ, হাদীস, আছার, ফিকহ, ইজতিহাদ, যুহদ ও আরাবিয়্যাতের দিকপাল মনীষীরা ছিলেন তাঁর শীষ্য। এঁদের সম্মিলিত আলোচনা ও পর্যালোচনার দ্বারা ফিকহে হানাফী সংকলিত হয়েছে। সমকালীন হাদীস ও ফিকহের বিখ্যাত ইমামগণও ফিকহে হানাফীর এই বৈশিষ্ট্য সর্ম্পকে সচেতন ছিলেন। কুফা নগরীর বিখ্যাত মনীষী ইমাম সুলায়মান ইবনে মিহরান আমাশ রাহ. (১৪৮ হি.) কে এক ব্যক্তি মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তখন (ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর মজলিসের দিকে ইঙ্গিত করে) বললেন, এঁদের জিজ্ঞাসা করুন। কেননা, এঁদের নিকট যখন কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তখন তারা সম্মিলিতভাবে মতবিনিময় করেন এবং (সর্বদিক পর্যালোচনার পর) সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন।'-জামিউল মাসানীদ, আবুল মুআইয়াদ খুয়ারাযমী ১/২৭-২৮ ইবনে কারামাহ বলেন, 'আমরা একদিন ওকী ইবনুল জাররাহ রাহ. এর মজলিসে ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি কোনো বিষয়ে বললেন, 'আবু হানীফা এখানে ভুল করেছেন।' ওকী বললেন, আবু হানীফা কীভাবে ভুল করতে পারেন, তাঁর সঙ্গে রয়েছেন আবু ইউসুফ, যুফার ইবনুল হুযাইল ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের মতো ফকীহ ও মুজতাহিদ, হিব্বান ও মানদালের মতো হাফিযুল হাদীস, কাসিম ইবনে মা'ন-এর মতো আরাবিয়্যাতের ইমাম এবং দাউদ ইবনে নুছাইর ত্বয়ী ও ফুযাইল ইবনে ইয়াযের মতো আবিদ ও যাহিদ? এই পর্যায়ের সঙ্গী যাঁর রয়েছে তিনি ভুল করবেন কীভাবে? কখনো যদি তাঁর ভুল হয় তবে তো এঁরাই তাকে ফিরিয়ে আনবেন।'-প্রাগুক্ত পৃ. ৩৩ ইমাম আসাদ ইবনুল ফুরাত রাহ. (২১৩ হি.) বলেন, 'ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর চল্লিশজন সঙ্গী গ্রন্থসমূহ (ফিকহে হানাফী) সংকলন করেছেন। তাঁদের শীর্ষ দশজনের মধ্যে ছিলেন আবু ইউসুফ, যুফার, দাউদ ত্বয়ী, আসাদ ইবনে আমর, ইউসুফ ইবনে খালিদ ও ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবী

যাইদা। শেষোক্ত জন সিদ্ধান-সমূহ লিপিবদ্ধ করতেন। দীর্ঘ ত্রিশ বছর তিনি এই দায়িত্ব পালন করেছেন।'-ইবনু আবিল 'আওয়াম-এর সূত্রে যাহিদ হাসান কাওছারী-ভূমিকা, নসবূর রায়াহ ১/৩৮

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : অবিরাম আলোচনা ও পর্যালোচনা দ্বারা সুসংহত

ইতিহাসের বাস্তবতা এই যে, চার ইমামের সমকালে মুসলিম-জাহানে অনেক অগ্রগণ্য মুজতাহিদ বিদ্যমান ছিলেন। নিজ নিজ অঞ্চলে তাঁদের তাকলীদও হয়েছে। কিন্তু চার ইমামের বৈশিষ্ট্য এই যে, মনীষী সঙ্গীগণ তাঁদের মতামতকে সংরক্ষণ করেছেন এবং আলোচনা ও পর্যালোচনা দ্বারা সুসংহত করেছেন, যা অন্যদের বেলায় হয়নি। বস্তুত চার মাযহাবের দীর্ঘায়ু ও বিপুল বিস্তারের এটি অন্যতম প্রধান কারণ। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহ.-এর একটি পরিসংখ্যান থেকে তা অনুমান করা যাবে। তিনি 'ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন' গ্রন্থে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন ভূখণ্ডের ফকীহ ও মুজতাহিদদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা 'তবাকা' অনুসারে উল্লেখ করেছেন। এতে কুফা, শাম, মিসর প্রভৃতি বিখ্যাত কেন্দ্রের আলোচনা এসেছে। কুফা নগরীর আলোচনায় ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর সমসাময়িক সাতজন ফকীহর নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা, আবদুল্লাহ ইবনে শুবরুমা, সায়ীদ ইবনে আশওয়া, শরীক ইবনে আবদুল্লাহ, কাসিম ইবনে মা'ন, সুফিয়ান ছাওরী ও হাসান ইবনে হাই। পরবর্তী তবাকায় উল্লেখিত হয়েছেন সর্বমোট ১৪ জন। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এঁদের মধ্যে ৮ জনই 'আসহাবু আবু হানীফা' শিরোনামে। পক্ষান-রে সুফিয়ান ছাওরী ও হাসান ইবনে হাই রাহ. প্রত্যেকের ২ জন করে সঙ্গীর নাম উল্লেখিত হয়েছে। অবশিষ্ট দু'জন হলেন, হাফছ ইবন গিয়াছ ও ওকী ইবনুল জাররাহ। (ইলামুল মুয়াককিয়ীন ১/২৬) উল্লেখ্য, ইবনুল কাইয়িম রাহ. এ দু'জনকে আলাদাভাবে উল্লেখ করলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরাও 'আসহাবু আবী হানীফা'র অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ ইমাম আবু হানীফার সমসাময়িকদের মধ্যে কাসিম ইবনে মা'নকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ তিনিও ইমাম আবু হানীফার সঙ্গী এবং ফিকহে হানাফীর অন্যতম ইমাম। অন্য ফকীহদের কোনো শাগরিদ এই তবাকায় উল্লেখিত হননি। এ থেকে ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর মনীষী শীষ্যদের প্রাচুর্য সম্পর্কে অনুমান করা যায়। ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর মাঝে ব্যক্তিত্ব তৈরির অতুলনীয় যোগ্যতা ছিল। তাই তাঁর সোহবত ও তরবিয়ত থেকে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম যুফার ইবনুল হুযাইল, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান প্রমুখ মুজতাহিদ তৈরি হয়েছেন। পরবর্তীতে এই বৈশিষ্ট্য তাঁর শীষ্যদের মাঝেও বিকশিত হয়েছিল। সম্ভবত একটি দৃষ্টান্তই এক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে যে, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহ.-এর সোহবত থেকে তৈরি হয়েছেন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশশাফেয়ী। স্বয়ং ইমাম শাফেয়ী রাহ. তা কৃতার্থ চিত্তে স্মরণ

করতেন। তিনি বলতেন ‘ফিকহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে আমার প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহ করেছেন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান।’ (তারীখে বাগদাদ ২/১৭৬) তিনি আরো বলেছেন, ‘ফিকহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে সকল মানুষ (ইমাম) আবু হানীফার কাছে দায়বদ্ধ।’ (তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৪৬) তাই প্রতি যুগেই যোগ্য পূর্বসূরী থেকে যোগ্য উত্তরসূরী পয়দা হয়েছেন এবং কখনো ফিকহে হানাফীর ধারক ও বাহকের অভাব হয়নি। পঠন-পাঠন এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হয়েছে। মূল আলোচনায় ফিরে আসি। কুফা নগরীর পর ইবনুল কাইয়্যিম রাহ. শামের মুজতাহিদ ইমামদের তালিকা উল্লেখ করেছেন। এতে যাঁদের নাম এসেছে তারা হলেন : ইয়াহইয়া ইবনে হামযা, আবু আম্‌র আবদুর রহমান ইবনে আম্‌র আওযায়ী, ইসমাইল ইবনে আবিল মুহাজির, সুলায়মান ইবনে মূসা উমাভী ও সায়ীদ ইবনে আবদুল আযীয রাহ.। পরবর্তী তবাকায় ‘ছাহিবুল আওযায়ী’ উপাধী শুধু একজনের নামের সঙ্গেই দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ আব্বাস ইবনে ইয়াযীদ ছাহিবুল আওযায়ী। (ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন ১/২৭) ইমাম আওযায়ী রা. ছিলেন মুসলিম জাহানের বিখ্যাত মুজতাহিদদের অন্যতম। কিন্তু যোগ্য উত্তরসূরীর অভাবে তাঁর মাযহাব দীর্ঘায়ূ হয়নি। ফিকহের ইতিহাস লেখকরা বলেন, শাম ও আন্দালুসে ইমাম আওযায়ী রাহ. (১৫৭ হি.)-এর মাযহাব প্রচারিত হয়েছিল, কিন্তু হিজরী তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এখন শুধু ফিকহে মুকারান অর্থাৎ তুলনামূলক ফিকহের গ্রন্থাদিতে তাঁর মতামত পাওয়া যায়। মিসরের মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে উল্লেখিত হয়েছেন-আমর ইবনুল হারিছ, লাইছ ইবনে সা’দ ও উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু জা’ফর। পরবর্তী তবাকা সম্পর্কে ইবনুল কাইয়েম রাহ.-এর বক্তব্য- ‘এঁদের পর (মিসরের মুফতী ও মুজতাহিদ হলেন) ইমাম মালিক রাহ.-এর ‘আসহাব’ যেমন, আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহব, উছমান ইবনে কিনানা, আশহাব ও ইবনুল কাসিম রাহ.। এঁদের পর ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর ‘আসহাব’ যেমন, মুযানী, বুওয়াইতী ও ইবনু আব্দিল হাকাম। এরপর (সে অঞ্চলে) ব্যাপকভাবে ইমাম মালিক রাহ. ও ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর তাকলীদ হতে থাকে। কিছু মনীষী ব্যতিক্রম ছিলেন, যাঁদের নিজস্ব মতামত ছিল। যেমন মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে ইউসুফ ও আবু জা’ফর তহাবী।’(ই’লামুল মুয়াকিয়ীন ১/২৭) মিসরের বিখ্যাত মুজতাহিদ ইমাম লাইছ ইবনে সা’দ রহ. সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী রাহ. বলেছেন যে, ‘তিনি ফিকহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইমাম মালিকের চেয়েও অগ্রগামী ছিলেন, কিন্তু সঙ্গীগণ তাঁর মতামত সংরক্ষণ করেনি।’ (তাযকিরাতুল হুফফায ১/২২৪) এই সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান থেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে, চার মাযহাবের প্রচার ও সংহতির পিছনের যোগ্য ধারক ও বাহকদের অবদান অনস্বীকার্য। হাফেয আবদুল কাদের আলকুরাশী রাহ. (৬৯৬-৭৭৫ হি.) এর একটি বিবরণ উল্লেখ করে এই আলোচনা সমাপ্ত করব। ফিকহে হানাফীর মনীষীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থ ‘আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যা’র ভূমিকায় তিনি লেখেন, অন্যান্য মাযহাবের অনুসারীগণ তাঁদের মনীষীদের উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু

আমাদের কাউকে হানাফী মনীষীদের জীবনী সংকলন করতে দেখিনি। অথচ (তা একটি দীর্ঘ গ্রন্থের বিষয়বস্তু। কেননা, বিভিন্ন ভূখণ্ডের) হানাফী মনীষীদের সংখ্যা এত প্রচুর যে, তা গণনা করে শেষ করা যায় না। (কয়েকটি দৃষ্টান- দেখুন : ইমাম বুরহানুদ্দীন যারনুজী লিখিত) 'কিতাবুত তা'লীম'-এ বলা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা রাহ. থেকে যে মনীষীগণ তাঁর ফিকহ বর্ণনা করেছেন তাদের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। আর বলা বাহুল্য যে, তাঁদের প্রত্যেকের ছিল বহু সঙ্গী, যারা ওই ইলম ও ফিকহকে ধারণ করেছেন। ইমাম সামআনী বলেন, বুখারার খাইযাখাযা শহরে ইমাম আবু হাফস আলকাবীরের এত শাগরিদ রয়েছেন যে, গণনা করে শেষ করা যায় না। লক্ষ্য করুন, এটি বুখারার একটি মাত্র এলাকার কথা। ইমাম কুদূরী রাহ.-এর আলোচনায় বলেন, তিনি বিখ্যাত 'মুখতাছার'-এর রচয়িতা। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ অসংখ্য মানুষকে (তালিবে ইলমকে) উপকৃত করেছেন। আমাদের একজন হানাফী মনীষী আবু নাসর আলইয়াযী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, শাহাদত বরণের সময় তিনি এমন চল্লিশজন সঙ্গী রেখে গেছেন, যারা ইমাম আবু মানসুর মাতুরীদীর সমসাময়িক। তদ্রূপ 'আসহাবুল আমালী' যারা ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. থেকে 'আমালী' বর্ণনা করেছেন তাঁদের সংখ্যাও অগণ্য। সমরকন্দ ও মা-ওয়ারাউন্নাহ্‌রে ফিকহে হানাফীর কত মাশায়েখ ছিলেন তা কি গণনা করা সম্ভব? একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, যাকরদীজাহ শহরে একটি কবরস্থান আছে যার নাম 'তুরবাতুল মুহাম্মাদীন'। এখানে প্রায় চারশ' মনীষী শায়িত আছেন, যাঁদের সকলের নাম মুহাম্মাদ এবং প্রত্যেকে ছিলেন ফকীহ ও মুসান্নিফ (গ্রন্থকার)। (বুখারার), কালাবায শহরে 'মাকবারাতুস সুদূর' কবরস্থানে অসংখ্য হানাফী ফকীহ শায়িত আছেন। তদ্রূপ বুখারার নিকটে 'মাকবারাতুল কুযাতিস সাবআ'তে সমাহিত হয়েছেন অসংখ্য ফকীহ, যাদের অন্যতম হলেন ইমাম আবু যায়েদ আদ-দাবূসী। তদ্রূপ (পশ্চিম বাগদাদে) শূনীযে 'মাকবারা আসহাবে আবী হানীফা'তে অসংখ্য হানাফী ফকীহ সমাহিত আছেন। তদ্রূপ কত বিখ্যাত পরিবার ছিল, যাতে অসংখ্য ফকীহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দামাগানী পরিবার ও সায়েদী পরিবারের গ্রহ-নক্ষত্রদের কে গণনা করে শেষ করতে পারে? ... কাযিল কুযাত আবু আবদুল্লাহ দামাগানীর ঘরানা থেকে তো অসংখ্য ফকীহ বিচারকের দায়িত্বও পালন করেছেন। আমাদের একজন ফকীহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল মালিক হামাযানীর একটি বৃহৎ গ্রন্থ আমি দেখেছি, যাতে আবু আবদিল্লাহ দামাগানী ও ইমাম সায়মারীর শুধু ওইসব সঙ্গীর আলোচনা করা হয়েছে, যারা তাদের নিকট থেকে সরাসরি (ইলম ও ফিকহ) গ্রহণ করেছিলেন। তদ্রূপ ছাফফারিয়্যাহ পরিবার, নূহিয়্যা পরিবার ও লামগানী পরিবারেও অসংখ্য আলিম, যাহিদ, কাযী ও ফকীহ জন্মগ্রহণ করেছেন।-আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যা ১/৫-৯

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য : মুসলিম জাহানে কুরআন-সুন্নাহর আইন হিসেবে গৃহীত

ফিকহে হানাফী ছিল তৎ কালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজশক্তিগুলোর রাষ্ট্রীয় আইন। বিভিন্ন সালতানাতের সময় কুফা ও বাগদাদ থেকে শুরু করে পূর্ব দিকে কাশগর ও ফারগানা পর্যন্ত, উত্তরে হালাব, মালাত্ইয়া ও এশিয়া মাইনর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে মিসর ও কাইরাওয়ান পর্যন্ত ফিকহে হানাফী অনুসারে কাযা পরিচালিত হয়েছে। তাই মুসলিম জাহানের এই সুবিস্তৃত অঞ্চলে কুরআন-সুন্নাহর আইন বাস্তবায়ন এবং সুবিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ফিকহে হানাফীর অবদান অনস্বীকার্য। হিজরী দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কুরআন-সুন্নাহর জগদ্বিখ্যাত মনীষীদের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় যখন ফিকহে হানাফী সংকলিত হল তখন থেকেই মুসলিম জাহানের বিস্তৃত ভূখণ্ডে তা বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। হাদীস ও ফিকহের ইমামগণের মাধ্যমে বিখ্যাত শহরগুলোতে ফিকহে হানাফীর বহু কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে কুফা নগরীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., হযরত আলী ইবনে আবী তালিব রা. এবং অন্যান্য ফকীহ সাহাবীদের মাধ্যমে ফিকহে ইসলামীর যে বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছিল তা ইরাকের সীমানা অতিক্রম করে গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে। তখন প্রবল প্রতাপান্বিত আব্বাসী শাসনের পূর্ণ যৌবন। এ সময় ফিকহে হানাফীই রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে গৃহীত হল। খেলাফতে রাশেদার পর কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যদিও 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' থেকে বিচ্যুত হয়েছিল, কিন্তু আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর শাসন অক্ষুণ্ন ছিল। আর এর পিছনে মৌলিক অবদান ছিল কুরআন-সুন্নাহ থেকে আহরিত ফিকহে ইসলামীর। আব্বাসী শাসন ছাড়াও ছামানী, বনী-বুওয়াইহ, সালজুকী, গযনী ও আইয়ুবী শাসনামলেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। রাজ্যশাসন মুসলিম শাসকদের দ্বারা পরিচালিত হলেও বিচার-বিভাগ ছিল ফিকহে ইসলামীর অধীন। তাই আঞ্চলিক প্রশাসকদের কথা তো বলাই বাহুল্য, সালতানাতের প্রধান ব্যক্তিকেও কখনো কখনো সাধারণ বাদীর সঙ্গে বিবাদীর কাঠগড়ায় দাড়াতে হয়েছে। এটি ইসলামী ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। আর যখন এর ব্যতিক্রম হয়েছে তখন মুসলিম বিচারপতিগণ তাদের দৃঢ়তা ও আসম সাহসিকতার দ্বারা যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন তা সমকালীন বিশ্বের উজ্জ্বলতম ইতিহাস। বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এই প্রবন্ধে নেই। সচেতন ব্যক্তিদের তা অজানাও নয়। হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধে ইমাম আবু হানীফা রা.-এর বিখ্যাত সঙ্গীগণ কাযা ও বিচারের মসনদ অলংকৃত করেন। ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. (১৮৩ হি.) ছিলেন গোটা মুসলিম জাহানের কাযিউল কুযাত। হারুনুর রশীদের সময় দারুল খিলাফা রাক্কা শহরে স্থানান্তরিত হলে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহ. (১৩১-১৮৯ হি.) সে শহরে কাযার দায়িত্ব পালন করেন। তদ্রূপ ইমাম যুফার ইবনুল হুযাইল (১৫৮ হি.) বছরায়, ইমাম কাসিম ইবনে মা'ন (১৭৫ হি.) কুফায়, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবী যাইদাহ (১৮৪ হি.) মাদায়েনে, ইমাম আবু মুহাম্মাদ নূহ ইবনে দাররাজ (১৮২ হি.) কুফায়, ইমাম হাফস ইবনে গিয়াছ (১১৭-১৯৪ হি.) কুফা ও বাগদাদে (কুফায় তেরো বছর, বাগদাদে দুই বছর) আফিয়া ইবনে ইয়াযীদ আওদী (১৮০), বাগদাদে কাযা পরিচালনা

করেন। তদ্রূপ হুসাইন ইবনুল হাসান আওফী (২০১) পূর্ব বাগদাদে, আলী ইবনে যাবইয়ান আবসী (১৯২ হি.), ইউসুফ ইবনে ইমাম আবু ইউসুফ (১৯২ হি.) বাগদাদে, মুহাম্মাদ ইবনে মুকাতিল রাযী (২২৬ হি.) ও নাসর ইবনে বুজাইর যুহলী রায় শহরে কাযার দায়িত্বে ছিলেন। ইমাম ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবু হানীফা (২১২ হি.) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সামাআ (১৩০ হি.-২৩৩ হি.) ইমাম ঈসা ইবনে আবান ইবনে সাদাকা (২২১ হি.), আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক (২২৮ হি.), বিশর ইবনুল ওয়ালীদ কিনদী (২৩৮ হি.), হাইয়ান ইবনে বিশর (২৩৮ হি.), হাসান ইবনে উছমান যিয়াদী (২৪৩ হি.), উমার ইবনে হাবীব (২৬০ হি.) ইবরাহীম ইবনে ইসহাক (২৭৭ হি.), বুহলূল ইবনে ইসহাক (২৯৮ হি.), আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ আলবিরতী (২৮০ হি.) কাযী আবু খাযিম আবদুল হামীদ ইবনে আবদুল আযীয (২৯২ হি.), কাযী আহমদ ইবনে ইসহাক ইবনে বুহলূল (২৩১-৩১০ হি.), আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ নাইছাবুরী (৩৫১ হি.), আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ, আবু বকর দামাগানী, তহাবী ও কারখীর শীষ্য, হুসাইন ইবনে আলী সাইমারী (৩৫১-৪৩৬ হি.) প্রমুখ ফিকহ ও হাদীসের বিখ্যাত ইমাম ও তাঁদের শীষ্যদের উপর কাযার দায়িত্ব অর্পিত ছিল। বাগদাদ, কুফা, বছরা, আম্বার, হীত, মাওসিল, ওয়াসিত, মাম্বিজ, রায় প্রভৃতি বিখ্যাত শহরে তাঁরা ফিকহে হানাফী অনুসারে কাযা পরিচালনা করেছেন। মুসলিম জাহানের এই কেন্দ্রীয় শহরগুলিতে এত অধিক সংখ্যক ফকীহ ও কাযী বিদ্যমান ছিলেন, যা অনুমান করাও কঠিন। ইমাম সায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ 'কিতাবুল ইতিকাদ' গ্রন্থে আবদুল মালিক ইবনে আবিশ শাওয়ারিব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বসরার প্রাচীন ভবনের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, 'এই গৃহ থেকে সত্তরজন বিচারক বের হয়েছেন, যারা প্রত্যেকে ফিকহে হানাফী অনুসারে ফয়সালা করতেন ...।'- আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ ২/২৬৭ ইরাক যেহেতু ফিকহে হানাফীর মাতৃভূমি তাই এ সম্পর্কে অধিক আলোচনা বাহুল্য মনে হতে পারে। তাই ইরাক ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করে অন্যান্য ভূখণ্ডের আলোচনায় প্রবেশ করছি।

খোরাসান ও মা-ওয়ারাউন্নাহরে আগেই বলা হয়েছে যে, হিজরী দ্বিতীয় শতকেই ফিকহে হানাফী মুসলিম জাহানের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে হাদীস ও ফিকহের বিখ্যাত ইমাম, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (১০৭-১৯৮ হি.)-এর একটি উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, ''আমার ধারণা ছিল যে, ইরাকের দুটি বিষয় : আবু হানীফার ফিকহ ও হামযার কিরাআত কূফার পুল অতিক্রম করবে না, অথচ তা পৃথিবীর প্রান্তসমূহে পৌঁছে গিয়েছে।'-তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৪৮ তাঁর এই বক্তব্যের বাস্তবতা এভাবে বোঝা যায় যে, হিজরী দ্বিতীয় শতক সমাপ্ত হওয়ার আগেই খোরাসান ও মা-ওয়ারাউন্নাহ্‌র অঞ্চলেও ফিকহে হানাফী অনুযায়ী কাযা ও বিচার পরিচালিত হতে থাকে। ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর শীষ্যদের মধ্যে হাফস ইবনে আবদুর রহমান নাইছাবুরী (১৯৯ হি.), নাইছাবুরে, নূহ ইবনে

আবী মারইয়াম মারওয়াযী (১৭৩ হি.) মার্ভে, ইমাম উমার ইবনে মায়মূন বলখী (১৭১ হি.) বলখে (২০ বছরেরও অধিক) ও ইমাম আবু মুতী হাকাম ইবনে আবদুল্লাহ বলখী (১৯৭ হি., ৮৪ বছর বয়সে) বলখে (১৬ বছর) কাযার দায়িত্ব পালন করেন। বলখের শাসকের সঙ্গে তাঁর একটি চমৎ কার ঘটনা ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত আছে। (দেখুন : আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ ৪/৮৭ কুনা অংশ) খোরাসান ও মাওয়ারাউন্নাহর হচ্ছে মুসলিম জাহানের এমন এক ভূখণ্ড,যা ইরাক ও হারামাইনের মতো হাদীস ও ফিকহের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। বহু বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন। তদ্রূপ বিভিন্ন সময় তা ছিল মুসলিম শাসকদের রাজনৈতিক কর্মতৎ পরতারও প্রধান কেন্দ্র। আল্লামা তাজুদ্দীন আবদুল ওয়াহহাব ইবনে আলী আস-সুবকী রাহ. (৭২৭-৭৭১ হি.) লেখেন, ‘খোরাসানের কেন্দ্রীয় শহর চারটি : মার্ভ, নিশাপুর, বলখ ও হারাত। এগুলি খোরাসানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহর। এমনকি গোটা মুসলিম জাহানের কেন্দ্রীর শহর বললেও অত্যুক্তি হবে না। কেননা, এগুলো ছিল উলূম ও ফুনূনের মারকায এবং বিখ্যাত মুসলিম শাসকদের রাষ্ট্রীয় কর্মতৎ পরতার কেন্দ্র।’’- তবাকাতুশ শাফেইয়্যাতিল কুবরা ১/৩২৫ বিখ্যাত আব্বাসী খলীফা মামূনুর রশীদ দীর্ঘদিন মার্ভে ছিলেন। সে সময়ের একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসের গ্রন্থে তা বিস্তারিতভাবে আছে। সংক্ষেপে ঘটনাটি এই যে, খোরাসান অঞ্চলে ফিকহে হানাফীর ব্যাপক বিস্তার লক্ষ করে কিছু মানুষ ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন এবং ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর গ্রন্থসমূহ জলাশয়ের পানিতে ধুয়ে ফেলতে আরম্ভ করেন। বিষয়টি খলীফার দরবার পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তিনি তাদের তলব করে এ কাজের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তারা বললেন, এই ফিকহ হাদীসবিরোধী! মামুন নিজেও ছিলেন হাদীস ও ফিকহের প্রাজ্ঞ পণ্ডিত। যখন সুনির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা শুরু হল তখন মামুন নিজেই তাদের সকল অভিযোগ খণ্ডন করে ফিকহে হানাফীর ওই সিদ্ধান্তগুলো হাদীস দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন। তারা লা-জবাব হয়ে গেলে মামুন তাদের সাবধান করে দিলেন এবং বললেন, ‘এই ফিকহ যদি প্রকৃতপক্ষেই কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী হত তবে আমরা কখনো তা রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে গ্রহণ করতাম না।’ (মানাকিবুল ইমাম আযম, সদরুল আইম্মা; ইমাম ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস (টীকা) পৃ. ১০) হিজরী তৃতীয় শতকে ফিকহে হানাফীর যেসব মনীষী এ অঞ্চলে কাযা পরিচালনা করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন এই - নসর ইবনে যিয়াদ, আবু মুহাম্মাদ (২৩৩ হি.) ইমাম মুহাম্মাদ রাহ.-এর শীষ্য; নাইছাবুর দশ বছরেরও অধিক। হাইয়ান ইবনে বিশর (২৩৮ হি.), ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর শীষ্য; আসবাহান, পরে পূর্ব বাগদাদ। হাসসান ইবনে বিশর নাইছাবুরী (২৪৪ হি.), ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদের শীষ্য; নাইছাবুর। সাহল ইবনে আম্মার নাইছাবুরী (২৬৭ হি.), প্রথমে তূছ পরে হারাত। মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ ইবনে মূসা বুখারী (২৮৯ হি.) বুখারা। মুহাম্মাদ ইবনে আসলাম আযদী (২৬৮ হি.) সমরকন্দ। ইবরাহীম ইবনে মা’কিল নাসাফী (২৯৫ হি.) নাসাফ। হাফিযুল হাদীস

হিসেবেও বিখ্যাত ছিলেন। হাফেয যাহাবী রাহ. (৬৭৩-৭৪৮ হি.) 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে শানদার ভাষায় তাঁর আলোচনা করেছেন। ইমাম বুখারী রাহ. (১৯৪-২৫৬ হি.) থেকে তাঁর যে চারজন শীষ্য সহীহ বুখারী রেওয়ায়েত করেছেন তিনি তাদের অন্যতম। আবদুল্লাহ ইবনে সালামা, ইবনে সালমূয়াহ (২৯৮ হি.) নাইছাবুর। বিখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযাইমা রাহ. (৩১১ হি.) মাযহাবের ভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁর বিশ্বস-তা ও জ্ঞান-গরিমার কারণে কাযার জন্য তাঁর নামই প্রস্তাব করেন। চতুর্থ হিজরী শতকের মনীষীদের মধ্যে আহমদ ইবনে সাহল (৩৪০ হি.) ও ইসহাক ইবনে মুহাম্মাদ, আবুল কাসিম (৩৪২ হি.) সমরকন্দ, তাহির ইবনে মুহাম্মাদ বাকরাবাযী (৩৬৯ হি.) মার্ভ, হারাত, সমরকন্দ, শাশ, বলখ ও ফারগানায়, আতা ইবনে আহমদ আরবিনজানী (৩৬৯ হি.) সমরকন্দের আরবিনজান শহরে, আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ফুযযী (৩৭৪ হি.) তিরমিয শহরে, কাযিল কুযাত আহমদ ইবনুল হুসাইন মারওয়াযী (৩৭৭ হি.) খোরাসানে, উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আননাযরী (৩৮৮ হি.) নাসাফে, উতবা ইবনে খাইছামা নাইছাবুরী (৪০৬ হি.) খোরাসানে (৩৯২-৪০৫ পর্যন্ত) কাযা পরিচালনা করেন। শেষোক্তজন ছিলেন খোরাসানের বিখ্যাত ফকীহ। সমকালে ফিকহ, ফতোয়া ও অধ্যাপনায় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। হাকিম আবু আবদুল্লাহ নাইছাবুরী বলেন, '... তিনি নিজ যুগে অপ্রতিদ্বন্দী ছিলেন। খোরাসানে হানাফী মাযহাবের কোনো কাযী এমন ছিলেন না যিনি কোনো না কোনো সূত্রে তাঁর শীষ্য নন।' (আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যা ২/৫১১) এছাড়া কিছু পরিবার এমন ছিল, যাতে শত শত বছর পর্যন্ত বহু ফকীহ ও কাযী জন্মগ্রহণ করেছেন। ইমাম সায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ (৪৩২ হি.)-এর আলোচনায় হাফেয সামআনী রাহ. (৬১৫ হি.) বলেন, আজ পর্যন্ত নিশাপুরের কাযা ও বিচার সায়েদী পরিবারেই রয়েছে। একই কথা আবদুল কাদের কুরাশী (৭৭৫ হি.)ও বলেছেন।- আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যা ২/২৬৫ কাযিল কুযাত ইমাম আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনুল হুসাইন নাসিহী (৪৪৭ হি.) সুলতান মাহমুদ ইবনে সবক্তগীনের সময় বুখারার বিচারপতি ছিলেন। পরবর্তীতে নাসিহী পরিবারে বহু আলিম, ফাযিল, কাযী ও ফকীহ জন্মগ্রহণ করেছেন। দেখুন : আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যা ১/২৮১, ১/৪০৯ মোটকথা, খোরাসান ও মা-ওয়ারাউন্নাহরে এত অসংখ্য ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন এবং এত উঁচু পর্যায়ের মনীষীগণ কাযা ও বিচারের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, যা আজ অনুমান করাও সহজ নয়। উল্লেখ্য, খোরাসান, মা-ওয়ারাউন্নাহর ও বর্তমান ইরানের বিস্তৃত অঞ্চল আব্বাসী শাসন ছাড়াও বিভিন্ন সময় ছামানী, (২৬১-৩৯৫), বনী বুওয়াইহ (৩২০-৪৪৭ হি.), গযনভী (৩৬৬-৫৮২ হি.), সালজূকী (৪২৯-৫৫২ হি.) ইত্যাদি শক্তিশালী সালতানাতের অধীন ছিল। তাই বাগদাদের মতো এ অঞ্চলও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কর্মতৎ পরতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। সভ্যতা, জ্ঞানচর্চা ও জীবনযাত্রার মানের বিচারে এই ভূখণ্ড বাগদাদ ও ইরাকের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। ঐতিহাসিক মাকদিসী লেখেন, ''খোরাসান ও মা-ওয়ারাউন্নাহর গোটা সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্বাধিক উন্নত।

এটি একটি সমৃদ্ধ জনপদ। প্রচুর কৃষিজমি, জলাশয় ও ফলমুলের বাগান দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং মূল্যবান খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। নাগরিকরা অত্যন্ত সৎ , দানশীল ও অতিথিপরায়ণ। শহরগুলোতে সুশাসন ও নিরাপত্তা রয়েছে। গোটা ভূখণ্ডে অনেক মাদরাসা। আলিমদের সংখ্যা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি। ফকীহগণ বাদশাহর মতো প্রতাপ ও মর্যাদার অধিকারী। বিদআতী কর্মকাণ্ড নেই। মানুষ সীরাতে মুসতাকীমের উপর রয়েছে। মুসলমানগণ বাস্তবিকই এই ভূখণ্ডের উপর গর্ববোধ করতে পারেন।'-আহসানুত তাকাসীম ফী মা'রিফাতিল আকালীম পৃ. ২৬০; মিল্লাতে ইসলামিয়া কী মুখতাসার তারীখ ১/২৪৭ তদ্রূপ সমরকন্দ, নিশাপুর, রায় প্রভৃতি শহরের যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তাতে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান ইউরোপ-আমেরিকার শ্রেষ্ঠ শহরগুলোর চেয়েও মুসলিম জাহানের এই ভূখণ্ডগুলো শান্তিশৃঙ্খলা এবং সভ্যতা ও সুশাসনে অগ্রগামী ছিল। (প্রাগুক্ত) হিজরী সপ্তম শতকে তাতারীদের বর্বর আক্রমণে গোটা মুসলিম জাহান ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সেই সমৃদ্ধি আর ফিরে আসেনি। শুধু তাই নয় এর পরের ইতিহাস তো শুধু অশ্রু ও রক্তের ইতিহাস।

দামেশক, হলব ও মালাত্ইয়ায়

ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর সময়ে শামের ফকীহ ছিলেন ইমাম আবু আম্র আবদুর রহমান ইবনে আম্র আওযায়ী (১৫৭ হি.)। তিনি ফিকহে হানাফী সম্পর্কে অবগত ছিলেন। প্রথমদিকে অস্পষ্টতা থাকলেও ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহ.-এর মাধ্যমে তাঁর ভুল ধারণার অবসান ঘটেছিল। ফিকহে হানাফীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পর তিনি তাঁর মুগ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে যখন ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হল এবং উভয়ে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করলেন তখন এই মুগ্ধতা বিস্ময় ও ঈর্ষায় পরিণত হয়েছিল। (দেখুন : মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা, কারদারী, আছারুল হাদীসিশ শরীফ পৃ. ১১২) হিজরী তৃতীয় শতক ও তার পর দামেশক, হলব, হামাত ও শামের অন্যান্য শহরে, এমনকি সুদূর মালাত্ইয়াতেও ফিকহে হানাফীর কাযী বিদ্যমান ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আবু খাযিম আবদুল হামীদ ইবনে আবদুল আযীয (২৯২ হি.), ইমাম তহাবী ও ইমাম আবু তাহির আদদাববাসের শায়খ; আবু জা'ফর আহমদ ইবনে ইসহাক, আবুল হাসান আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া উকাইলী, আবুল হাসান আহমদ ইবনে হিবাতুল্লাহ, (৬১৩ হি.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শামের দামেশক, হলব প্রভৃতি বিখ্যাত শহরে তাঁরা কাযার দায়িত্বে ছিলেন। এ ছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম ও আহমদ ইবনে আবদুল মজীদ মালাত্ইয়ার কাযী ছিলেন। কাযী আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম রাহ.-এর পিতা ইবরাহীম ইবনে ইউসুফ মাকিয়ানী (২৪১ হি.) ফিকহে হানাফীর বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। (দেখুন : আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যা ১/১১৯) তদ্রূপ আহমদ ইবনে আবদুল মজীদের পিতা আবদুল মজীদ ইবনে ইসমাইল হারাভী (৫৩৭ হি.) বিলাদুর রোমের কাযী ছিলেন। হিজরী সপ্তম শতকে দামেশকের শাসক ছিলেন ঈসা

ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ুব (৫৬৭-৬২৪ হি.)। আট বছরেরও অধিক কাল তিনি দামেশকের শাসক ছিলেন। তিনি ও তাঁর বংশধরগণ ছিলেন ফিকহে হানাফীর অনুসারী। এ শতকে ফিকহে হানাফী অনুসারে কাযা পরিচালনাকারী কয়েকজনের নাম এই : ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম শাইবানী (৬২৯ হি.) দামেশক; খলীল ইবনে আলী হামাভী (৬৪১ হি.) দামেশক; আবুল কাসিম উমার ইবনে আহমদ (৫৮৮-৬৬০ হি.) হলব; আবদুল কাদের (৬২৩-৬৯৬ হি.) হলব; ইবরাহীম ইবনে আহমদ (৬৯৭ হি.) হলব; মাজদুদ্দীন আবদুর রহীম ইবনে উমার ইবনে আহমদ (৬৭৭ হি.) শাম; কাযিল কুযাত সুলায়মান ইবনে উহাইব, ইবনু আবিল ইয (৬৭৭ হি.) মিসর ও শাম, কাযিল কুযাত ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আযরায়ী (৫৯৫-৬৭৩ হি.) দামেশক; কাযিল কুযাত ইমাম আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ, হামাত; কাযিল কুযাত হাসান ইবনে আহমদ (৬৩১ হি.-৬৯৯ হি. আনু.) মালাত্ইয়াতে বিশ বছরের অধিক, অতঃপর দামেশকেও বিশ বছরের অধিক, সবশেষে মিসরে। ৬৯৯ হিজরীতে তাতারীদের আক্রমণের সময় নিখোঁজ হন। এঁদের পর কাযিল কুযাত আলী ইবনে মুহাম্মাদ, সদরুদ্দীন (৬৪২-৭২৭) দামেশক; কাযিল কুযাত আহমদ ইবনুল হাসান (৬৫১-৭৪৫ হি.) দামেশক; তাঁর পিতা ও দাদাও কাযিল কুযাত ছিলেন। কাযিল কুযাত আহমদ ইবনে আলী (৭১১ হি.) দামেশক; উমার ইবনে আবদুল আযীয, ইবনে আবী জারাদা (৬৭৩ হি.-৭২০ হি.) হলব, তার মৃত্যুর পর তার পুত্র নাসিরুদ্দীন মুহাম্মাদ কাযিল কুযাত হন; কাযিল কুযাত আলী ইবনে আহমদ তরাসূসী (৬৬৯-৭৪৮ হি.) দামেশক; প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের পরিচয় ও অবদান সম্পর্কে জানার জন্য আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ, আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যা ও অন্যান্য জীবনী-গ্রন্থ অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

পশ্চিমে মিসর ও কাইরাওয়ানে

লোহিত সাগরের পশ্চিমে মিসরেও ফিকহে হানাফী হিজরী দ্বিতীয় শতকেই প্রবেশ করেছিল। এ অঞ্চলে ফিকহে হানাফীর প্রথম কাযী ছিলেন আবুল ফযল ইসমাইল ইবনুন নাসাফী আলকুফী। তিনি মাহদীর সময় ১৬৪ হি. থেকে ১৬৭ হি. পর্যন্ত কাযার দায়িত্বে ছিলেন। মিসরের বিখ্যাত মুজতাহিদ লাইছ ইবনে সা'দ রাহ. ফিকহী মতভেদ সত্ত্বেও তাঁর যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। (দেখুন : আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ ১/৪৩৮-৪৩৯) এছাড়া মুহাম্মাদ ইবনে মাসরূক আল কিনদী ১৭৭ হি. থেকে ১৮৫ হি. পর্যন্ত, হাশিম ইবনে আবু বকর আলবাকরী (১৯৬ হি.) ১৯৪ হি. থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মিসরে কাযার দায়িত্বে ছিলেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরুতে কাযী ইবরাহীম ইবনুল জাররাহ (২১৭ হি.) ২০৫ থেকে ২১১ হি. পর্যন্ত কাযা পরিচালনা করেন। তবে এ শতাব্দীতে যিনি দীর্ঘ সময় মিসরের কাযার দায়িত্বে ছিলেন এবং গোটা মিসরে যাঁর প্রভাব ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল অতুলনীয় তিনি হলেন ইমাম বাক্কার ইবনে কুতাইবা রাহ. (২৭০ হি.)। ২৪৬ হিজরীতে কাযার দায়িত্ব নিয়ে মিসরে

এসেছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ২৩ বছরেও অধিককাল গোটা মিসরের অপ্রতিদ্বন্দী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক আরেকজন হানাফী মনীষী হলেন ইমাম আবু জা'ফর আহমদ ইবনে আবী ইমরান (২৮০ হি.) ২০ বছরেরও অধিক কাল তিনি মিসরে অবস্থান করেছেন। হিজরী তৃতীয় শতকের বিখ্যাত মুজতাহিদ আবু জা'ফর তহাবী (মৃ. ৩২১ হি.) উপরোক্ত দু'জনেরই সাহচর্য পেয়েছিলেন। তদ্রূপ মুহাম্মাদ ইবনে আবদা ইবনে হারব, আবু আবদিল্লাহ বসরী (৩১৩ হি.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। ছয় বছর সাত মাস প্রতাপের সঙ্গে কাযা পরিচালনা করেছেন। তাঁর দুটি মজলিস হত : হাদীসের মজলিসে মুহাদ্দিসগণ ও ফিকহের মজলিসে ফকীহগণ শরীক হতেন। এছাড়া ইসহাক ইবনে ইবরাহীম শাশী (৩২৫ হি.), মুহাম্মাদ ইবনে বদর ইবনে আবদুল আযীয, আবু বকর মিসরী (২৬৪-৩৩০ হি.) (ইমাম তহাবীর শীষ্য) ও ইমাম আবুল আব্বাস ইবনু আবিল আওয়াম (৪১৮ হি.) প্রমুখ মিসরে কাযা পরিচালনা করেছেন। ইমাম ইবনু আবিল আওয়াম রাহ. ১২ বছর ছয় মাস ২৫ দিন কাযার দায়িত্বে ছিলেন। (দেখুন : আলউলাতু ওয়াল কুযাত, টীকা হুসনুল মুহাযারা ২/১৪৮) হিজরী সপ্তম শতকের মাঝামাঝিতে আল মালিকুয যাহির বাইবার্‌ছ (৬২৫-৬৭৬ হি.) প্রথমে কাহেরা (কায়রো) পরে দামেশকে প্রত্যেক মাযহাবের আলাদা কাযী নিয়োগের নিয়ম জারি করেন। ওই সময় থেকে দশম শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত যারা ফিকহে হানাফী অনুযায়ী কাযা পরিচালনা করেছেন তাদের একটি তালিকা হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহ. (৯১১ হি.) উল্লেখ করেছেন। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন হলেন, সদরুদ্দীন সুলায়মান, ইবনু আবিল ইযয (৬৭৭ হি.), মুয়িযযুদ্দীন আন-নু'মান ইবনুল হাসান (৬৯২ হি.), হুসামুদ্দীন আলহাসান ইবনে রাযী (৬৯৯ হি. আনু.), শামছুদ্দীন আহমদ ইবনে ইবরাহীম আস-সারুজী (৭০১ হি.) শামছুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে উছমান (৭২৮ হি.), ইমাম বুরহানুদ্দীন আলী ইবনে আহমদ (৭৪৪ হি.), আলাউদ্দীন আলী ইবনে উছমান (৭৪৫ হি.) এরপর তাঁর পুত্র জামালুদ্দীন আবদুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে উছমান (৭৬৯ হি.), কাযিল কুযাত আসসিরাজুল হিন্দী উমর ইবনে ইসহাক গযনবী (৭৭৩ হি.), জামালুদ্দীন মাহমুদ ইবনে আলী আলকায়সারী (৭৯৯ হি.), কাযিল কুযাত শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ তরাবলুসী (৭৯৯ হি.), কাযিল কুযাত শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ মাকদিসী (৮২৭ হি.), কাযিল কুযাত যাইনুদ্দীন আবদুর রহীম ইবনে আলী আততাফাহ্‌নী (৮৩৫ হি.), কাযিল কুযাত বদরুদ্দীন মাহমুদ ইবনে আহমদ আলআইনী (৮৫৫ হি.) সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার; কাযিল কুযাত সা'দুদ্দীন ইবনে কাযিল কুযাত শামসুদ্দীন (৮৬৭ হি.) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (দেখুন : হুসনুল মুহাযারা ২/১৮৪-১৮৭) তাঁর আরেকটি তালিকার শিরোনাম হল, 'ফিকহে হানাফীর যে মনীষীগণ মিসরে ছিলেন'। এই তালিকার অধিকাংশ নাম পূর্বের তালিকাতেও এসেছে, কিছু নাম আছে, যা ওই তালিকায় নেই। তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন হলেন-ইমাম জামালুদ্দীন আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে সুলায়মান বলখী (৬৯৮ হি.), আবুল হাসান আলী ইবনে বালবান

(৭৩১ হি.) সহীহ ইবনে হিব্বান বিষয়ভিত্তিক বিন্যাসে তিনিই বিন্যস- করেছেন; ফখরুদ্দীন উছমান ইবনে ইবরাহীম মারদীনী, ইবনুত তুরকুমানী (৭৩১ হি.) ইনি আল জাওহারুন নাকী রচয়িতা আলাউদ্দীন ইবনুত তুরকুমানীর পিতা; কানযুদ দাকাইক গ্রন্থের ভাষ্যকার ফখরুদ্দীন উছমান ইবনে আলী আযযায়লায়ী (৭৪৩ হি.); আমীর কাতিব আলইতকানী (৭৫৮ হি.); আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ-গ্রন্থকার আবু মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ইবনে মুহাম্মাদ আলকুরাশী (৭৭৫ হি.); আকমালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আলবাবরতী (৭৮৬ হি.), সিরাজুদ্দীন উমর ইবনে আলী কারিউল হিদায়া (৮২৯ হি.); ফাতহুল কাদীর রচয়িতা ইমাম ইবনুল হুমাম কামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ (৮৬১ হি.); আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ আশশুমুননী (৮৭২ হি.), সাইফুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উমর ইবনে কুতলূবুগা (৮৮১ হি.) প্রমুখ। এই তালিকায় সুয়ূতী রাহ. তাঁর উস্তাদ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে কুতলূবুগা (৮৮১ হি.) পর্যন্ত ৫৮ জন বিখ্যাত ফকীহর নাম উল্লেখ করেছেন। (দেখুন : হুসনুল মুহাযারা ১/৪৬৩-৪৭৮) আফ্রিকার কাইরাওয়ানে কাযা পরিচালনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুন আর-রূআইনী (২৯৯ হি.)। বিভিন্ন তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, প্রায় ত্রিশ বছর যাবত তিনি কাইরাওয়ানে অবস্থান করেছেন। তিনি ফিকহে হানাফীর উপর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। (দেখুন : আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যা ৩/১৮৯) তারও আগে কাইরাওয়ানের কাযী ছিলেন ইমাম আসাদ ইবনুল ফুরাত (২১৩ হি.) তিনি যেমন ফিকহে মালেকীর ইমাম তেমনি ফিকহে হানাফীরও ইমাম ছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনে খিল্লিকান বলেছেন, আফ্রিকায় ইমাম আবু হানীফার মাযহাবই ছিল সর্বাধিক প্রচারিত ও অনুসৃত। হিজরী পঞ্চম শতকে মুয়ীয ইবনে বাদীছ (৩৫৮-৪৫৪ হি.) এর হাতে কর্তৃত্ব আসার পর তিনি এ অঞ্চলের অধিবাসীদের ফিকহে মালেকী অনুসরণে বাধ্য করেন।-আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যা ১/৯

মোটকথা, মাশরিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত মুসলিম জাহানের বিখ্যাত শহরগুলোতে ফিকহে হানাফীর দ্বারা কুরআন-সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর তখন মুসলিম সাম্রাজ্য ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য এবং মুসলিম উম্মাহ ছিল পৃথিবীর সেরা শক্তি। মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক উত্থান ও প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় পর্বে সালতানাতে উছমানিয়া ও বৃটিশের অনুপ্রবেশের আগ পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশেও ফিকহে হানাফী অনুসারে কাযা ও বিচার পরিচালিত হয়েছে। বলাবাহুল্য যে, এই পর্বের ইতিহাসও ফিকহে ইসলামীর যেকোনো পাঠককে উদ্দীপ্ত করবে।

আজ মুসলিম সমাজের যে শ্রেণী রোমান ল' ও বৃটিশ আইনের প্রতি অতিমুগ্ধতায় আচ্ছন্ন এই ইতিহাস তাদের চরম দৈন্যকে প্রকাশ করে। তদ্রূপ যারা আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী তাদের জন্যও এই ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে।

পুনশ্চ : এই লেখাটি যখন আরম্ভ করি তখন শিরোনাম ছিল, 'ইমাম আবু হানীফা ও ফিকহে হানাফী : কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য।' কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর যখন প্রথম অংশটি দীর্ঘ হতে আরম্ভ করল তখন তা রেখে দিয়েছি। আবার নতুন করে অনুভব করেছি যে, ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর জীবনের যে কোনো একটি দিক তুলে ধরতে হলেও স্বতন্ত্র প্রবন্ধ; বরং গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। বর্তমান আলোচনা থেকেও তাঁর প্রজ্ঞা ও ব্যক্তিত্ব এবং কুরআন-সুন্নাহ্য় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য অনুমান করা সম্ভব। মুসলিম জাহানের চরম উন্নতির যুগে ফিকহে হানাফীর বিপুল গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করে যে, তা পরিপূর্ণভাবে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক এবং এর সংকলকগণ ছিলেন কুরআন-সুন্নাহর মুজতাহিদ ইমাম। তবে কেউ যদি গোটা বিশ্বের সকল মানুষকেই নির্বোধ মনে করেন তাহলে তার সঙ্গে আর আলোচনার সুযোগ থাকে না। আমরা তার জন্য শুধু দুআ করতে পারি, আল্লাহ যেন তাকে হেদায়েত দান করেন।

ঝকঝকে তকতকে বাংলা পড়ুন